ধ্যান

মোল্লা বাহাউদ্দিন

দেখতে দেখতে খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে গেল। সিলেটে শাহজালাল মাজারের অদূরে এক কামেল দরবেশ এসেছেন - অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারি। গেরুয়া বসনে আবৃত কাঁচাপাকা চুলের জঠাধারি এই কামেল বাবা অলৌকিকভাবেই দরগার সন্নিকটে তেঁতুল গাছটার নীচে আসন নিয়েছেন। এই আগের দিনও ওখানে কোন ঘরের চিহ্ন ছিলনা। আশে পাশে ঝোপঝাড় কাটাবন। রাতারাতি কেমন করে ওখানে খুপরি ঘর হয়ে গেল আর বাবাই বা আসলেন কোথা থেকে! বাবা সদাই মুদিত নয়নে ধ্যানে মগ্ন। ক্বচিৎ দুএকটা কথা বলেন। আজ তিন দিন বাবা কোন খাবার স্স্লর্শ করেন নাই। এমন দরবেশ কামেল না হয়েই যায়না। তাঁদের ক্ষুধা নিবারণ হয় নাম জপের ভেতর। পার্থিব জগতের মাঝে থাকলেও বাবা অনেক উর্ধ্বে, উর্ধ্বলোকে মিশে আছেন।

শাহজালালের মাজারে নানা মানুষ আসে নানারকম মানত নিয়ে জিয়ারত করতে। কিছু মানুষ আছে যারা সর্বদাই মাজারের আসে পাশে ঘুরে বেড়ায়। বিদেশিকে পথ দেখিয়ে, টুকটাক কাজ করে দু পয়সা কামায়। সেদিন ভোরে তাদেরই একজন গিয়েছিল প্রাকৃতিক কার্য সামাধা করতে ঝোপের দিকে। তেতুঁল গাছটার নীচে বাবাকে একাকি ধ্যানমগ্ন দেখে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া না দিয়ে বসে পড়ল বাবার পদতলে। মিনতি জানাল, বাবা, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি কোন কূলকিনারা পাচ্ছিনা। আমাকে একটা রোজগারের পথ দেখিয়ে দাও!

তেতুঁল গাছটার অদূরে পায়ে চলা মেঠো পথ। তখন ওপথ দিয়ে দুজন লোক যাচ্ছিল। লোকটার কাকুতি মিনতি শুনে তারা এগিয়ে এসে বাবাকে দেখে তারাও বসে পড়ল। যার যার আর্জি নিয়ে। এমনি করে একে দুয়ে বাড়তে লাগল। বাবার মাথার উপর দাড়ি দিয়ে একটা আচ্ছাদন তৈরি হয়ে গেল। রৌদ্রতাপ মাথা গরম করে, ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। বিকেল পর্যন্ত হাজার হাজার লোক দলে দলে এসে বাবার পদধূলি নিয়ে আর্জি জানায়। বাবা ইশারায় সান্ত্বনা দিয়ে বিদেয় করেন। বাবার দোয়ায় সকলে ধন্য হয়ে ফিরে যায়। বাবার কাছে মানুষ যখন তাদের দুঃখের কাহিনী বলতে থাকে বাবা তখন তার অতীতে ফিরে যান। তার মাথায় কুলসুমের স্মৃতি কিলবিল করতে থাকে। ছবির মত ভেসে আসে একটার পর একটা। যখন মনে হয় কুলসুমের জন্যই বাবা তার পুরুষাঙ্গ কর্তন করে বৈরাগি হয়েছে তখন তার মুখের ভাব বদলে যায়। সেই মুহূর্তের কথা মনে হলেই বাবা শিউড়ে উঠেন। উত্তেজিত হয়ে যান। দাঁত কিড়মিড় করে মুদিতনয়নে ছটফট করতে থাকেন। আর ভক্তদের দল তখন বাবার পদতলে ঝাঁপিয়ে পড়ে – বাবা এখন ধ্যানে মগ্ন, উর্দ্ধলোকে মিশে আছেন। অতএব এই মোক্ষম সময়। বাবার পদধূলি গ্রহন করার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

একদল লোক বাবার খেদমতে লেগে গেছে। তারা খেদমতগার। বাবার সবকিছু তারা নিয়ন্ত্রন করছে। এত লোকের পা কামড়ানিতে বাবার অসুখ হয়ে যাবে। স্বাস্থের দিকে নজর রাখতে হবে। তাই বাবার চারদিকে শক্ত বেড়া হয়ে গেছে। গেইটে একজন খেদমতগার। একজন দুজন করে বাবার কাছে পাঠাচ্ছে। যদি কেউ বাবার জন্য নজরানা দিতে চায় তাহলে পাশে তালা দেয়া কাঠের বাক্সে রাখলেই হবে। বাবার জন্য যারা ফলমূল খাবার নিয়ে আসে তা ওপাশে ঝুড়িতে রাখলেই চলবে। বাবা পেয়ে যাবেন। বাবার বিশ্রামের প্রয়োজন। সময়ের একটা হিসেব প্রয়োজন। একটা কাগজে লিখে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে, মোলাকাতের সময়সূচী। ফজরের পর থেকে বেলা বারটা পর্যন্ত। যোহর বাদ আছর পর্যন্ত।

খেদমতগাররা যখন এসব ব্যবস্থা করছিল বাবা তখন অতীতের জগতে। তার মনে পড়ে তার বাড়ীর কথা। বাবা-মা ভাইবোনের কথা। ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার নেমতাবাদ গ্রামের ছেলে নান্নু। কিভাবে কেমন করে এই দরবেশ বনে গেল তাই ভাবে। বাবা ধ্যান করে। প্রায় চব্বিশ ঘন্টা ধ্যানে মগ্ন থাকে। তবে পরমেশ্বরের ধ্যানে নয়, তার নিজের ধ্যানে। কোথা থেকে কি হয়ে গেল! কোথায় কুলসুম! কোথায় তার পুরুষাঙ্গ! কোথায় বাড়ীঘর! কুলসুমের জন্যই তার এই পরিণতি! কুলসুম কোথায় কে জানে! একবার কুলসুমের স্মৃতি আর মানুষের টিটকারি এমন এলোপাথারি নাচন শুরু করেছিল যে, নান্নু আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। সে যখন গাছে দড়িটা লাগিয়ে নিজের গলাটা দিতে যাবে তখনই কোথা থেকে নেংটা বাবা এসে হাজির। অথচ এই বনের ভেতর কোন মানুষজন আসার কথা নয়। নান্নুর মনে হল নিশ্চয়ই এটা অলৌকিক ব্যাপার। না হয় এসময়

নেংটা বাবা আসবে কেন? নেংটাবাবা বললেন, আয়, নেমে আয় গাছ থেকে। আত্নহত্যা মহা পাপ! আয় আমি তোর সব দুঃখ মুছে দেব! নেংটাবাবার আদেশ অমান্য করতে পারেনি নান্নু। প্রথমে আখাউড়া জংসনে বসেছিল বাবা। নান্নু বলল, বাবা এখানে তো আমাকে চিনে ফেলবে। এখানে নয়। তারপর বাবার সাথে কত জায়গা, দরগাহ, উরছ আর গাঁজার আশ্রমে ঘুরেছে! তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল লেগেছে ঢাকার হাইকোর্টের মাজার। এখানে অনেক বাবা আছে। রাতদিন কলকি বদল চলতে থাকে। কেউ টিটকেরি দেয়না। এখানেই কলকি টানার ব্যাপারটা ভাল করে রপ্ত করে নান্নু। বেশ আরামে কাটছিল দিন। হঠাৎ বড় বাবাকে পুলিশে নিয়ে গেল আর সব উলট পালট হয়ে গেল। আশ্চর্য! পুলিশ আর কাউকে ধরেনি, শুধু বড় বাবাকে নিয়ে গেল। এটা নুরা পাগলা! তখনই নান্নু জানতে পারল বড় বাবা নুরা পাগলা। যাবার সময় বাবা আদেশ করে গেল, যে যেখানে পার চলে যাও। আমি কিছুদিনের মধ্যেই ফিরব। তারপর আবার চলা। নেংটাবাবার সাথে অনেক জায়গা ঘুরে আবার মিরপুর মাজারে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন নেংটাবাবা মরে গেল। আর নান্নু হয়ে গেল একবারে একা। সঙ্গী সাথি হারা। একা পড়ে যাওয়ায় নান্নুর অতীতটা জোড়েশুরে পীড়া দিতে লাগল। যথা ইচ্ছে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু অতীতটা তাকে রেহাই দিচ্ছেনা। চব্বিশটা ঘন্টা অতীতের ধ্যানে মগ্ন থাকে। ভক্তরা ভাবে বাবা উর্ধ্বলোকে মিশে গিয়ে ধ্যানে মগ্ন। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারি।

বাবার ধ্যানে বাধা পড়েনা। খেদমতগার ভক্তকে অনুমতি দেবার আগে বাতলে দেয় কি রকম তাজিমের সাথে কিভাবে আরজি পেশ করতে হবে। তার সুখদুখ জানাবার সময়সীমা কতটুকু। বাবার আশীর্বাদের কত রকম সঙ্কেত আছে সব বাতলে দেয়। বাবা যখন কপালের চামড়া খিচিয়ে থাকেন তখন বাবা কঠিন কিছু একটা ভাবতে থাকেন। সে সমস্যার সমাধান বাবা ছাড়া কেউ করতে পারবে না। বাবা যখন চুপচাপ অন্যনস্ক থাকেন তখন নতুন কিছু ধ্যান করেন। মাথা কোনদিকে দুলালে কি বুঝায়, কতটুকু আশীর্বাদ এবং সফলতা পাওয়া যাবে তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়। সবচেয়ে মোক্ষম সময় হল বাবা যখন শিউড়ে উঠেন। ঐ সময় বাবার পা চেপে ধরতে পারলে আর কোন চিন্তা নেই। দুনিয়া আখেরাতের সব মঙ্গলজনক। ঐ শিউড়ে উঠা কাপন ধরা সময়টা কয়েক জন পেয়েছে, তাদের সৌভাগ্য হয়েছে বাবার পায়ে মাথা রেখে পড়ে থাকার।

ভক্তরা যখন তার পায়ের উপর মাথা রেখে তাদের দুঃখ অবসানের মিনতি জানায় নান্নু তখন কুলসুমের ধ্যানে মগ্ন থাকে। সেই কবে কুলসুমের সাথে তার প্রথম দেখা। নান্নুদের পাড়ার গোজা বুড়ির মেয়ে মারা গেলে তার পাঁচ বছরের সন্তান কুলসুমকে নিয়ে আসে তার কাছে। তখন নান্নু ছিল বার বছরের কিশোর। নান্নু তার বাবার সাথে ক্ষেতে কাজ করত আর কুলসুম তার নানির সাথে পাড়া বেড়াত। বছর কয়েক পরে একদিন সন্ধ্যায় কুলসুম গিয়েছিল কালা হাঁসটা খুজতে ডোবার ধারে। নান্নু এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। কোন মতেই হাঁসটাকে ধরতে পারছিল না কুলসুম। নান্নু এগিয়ে এসে বেত ছোবার ভেতর থেকে হাঁসটা ধরে দিয়েছিল। সেই থেকে নান্নুর প্রতি কুলসুমের একটা সমীহের সৃষ্টি হয়। ক্রমে এই সমীহ একদিন ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। এখন নান্নু একুশ বছরের যুবক আর কুলসুম চৌদ্দ বছরের কিশোরি। যখন তখন তাদের দেখা হয়। মনের খেলা চলে। আর এই মনের খেলা বাদ দিয়ে দৈহিক খেলা খেলতে গিয়েই তার পুরুষাঙ্গ কাটা গেল-সে কথা মনে হতেই নান্নু কেপে কেপে শিউরে উঠে। ভক্তরা তখন আরও জোরে পা চেপে ধরে - এই বুঝি বাবা অলৌকিক কিছু করে বসবে, আশা পূরণ হবে!

কুলসুমের স্মৃতি বাবার মাথায় কিলবিল করে। অষ্টপ্রহর তাকে জ্বালাতন করে। ভুলতে পারেনা, বার বার ফিরে ফিরে আসে। সে ধ্যান করে। কুলসুমের স্মৃতি। কুলসুমের চুলের গন্ধ, গায়ের গন্ধই তার কাল হয়েছে! মনে আসে শেষ দিনের কথা। বিকেলে নান্নু ডোবায় ছিপ দিয়ে মাছ ধরছিল। কুলসুম কখন বাঁশঝাড় পেরিয়ে নান্নুর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি। তারপর পানির মাছের কথা ভুলে ডাঙ্গার মাছটার সাথেই খেলছিল। কথা শেষ হয়না। কখন যে বেলা ডুবে গেল কেউ খেয়াল করেনি। হঠাৎ করেই যেন আঁধার এসে গ্রাস করে ফেলল পৃথিবীটাকে। এই অন্ধকারে কুলসুম একা ঘরে যেতে পারবে না। নান্নুকে বলল এগিয়ে দিয়ে আসতে। নান্নু অনেক যতনে বাঁশঝাড় আম বাগানের ভেতর দিয়ে ভূত প্রেতের ভয় থেকে আগলে নিয়ে যাচ্ছিল কুলসুমকে। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না নান্নু। আম গাছটার নীচে বসে পড়ল। কুলসুমের চুলে, গায়ে, কাপড়ে কিসের গন্ধ! এই পাগল করা কিসের সুবাস! নান্নুর সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। বসে পড়ল আমগাছটার নীচে। কুলসুম জিজ্ঞেস করল, কি অইল! বইয়া পরলেন কেন?

নান্নু জবাব দিতে পারেনি। জবাব দেবার অবস্থা তার নেই। মনে হল তার শরীরের অনেকগুলো যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কুলসুমের ঘরের কাছে আসতেই কুলসুম বলল, আর আইতে অইবনা। বলে কুলসুম বেগুনক্ষেতের ভেতর দিয়ে চলে গেল।

নান্নু দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষন। যেন বাজপরা মৃতদেহ। কি যে হল কিছুই বুঝতে পারছে না! দিশেহারা! পাগল করা গন্ধটা! মনে হল এখানে ওখানে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে। এ যেন চুম্বক! কাছে টানে! একবার বুড়ির ঘরের দিকে পা বাড়াল। হঠাৎ অনেকগুলো প্রশ্ন এসে সামনে দাড়াল। বুড়িটা করাইত্যা! সবাই জানে, ভয় পায়। কুলসুমকে কড়া নজরে রাখে। এদিক সেদিক যাবার উপায় নেই। আজ বিকেলে পাশের বাড়ীতে বুড়ি গিয়েছিল রুগী দেখতে। এই সুযোগে কুলসুম এসেছিল ডোবার ধারে। এই রাতের বেলায় ঘরে গেলে চিৎকার চেচামেচি করবে! বিচার, সালিশ! নান্নু থেমে গেল। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে এক সময় বাড়ী ফিরে এল। অস্থিরভাবে বাড়ীর এদিক সেদিক পায়াচারি করল। এক সময় বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে গেলে গন্ধটা যদি মুছে যায়!

বিছানায় শুয়ে দেখল সমস্ত ঘর কুলসুম আর সুবাসে ছেয়ে আছে। পাগল করা সুবাসটা! তাকে দংশন করছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে! তাকে মাতাল করে দিচ্ছে।

অনেকক্ষন ঘুমের চেষ্টা করল। নাহ্, ঘুম নেই। চলে গেছে চিরতরে। বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। মাতালের মত এদিক সেদিক ঘুরে একসময় খালের পাড় এসে দাঁড়াল। নিজের অজান্তেই বসে পড়ল। নিশুতি রাত। ঝি ঝি পোকার কান্না। বহুদূরে শেয়ালের ডাক আর কুকুরের চিৎকার শোনা যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল তারার ঝিলমিল। মনে হল কুলসুম আর তার সুবাস ছড়িয়ে আছে। যেন তার দিকে তাকিয়ে ক্রুর হাসি হাসছে। সুবাসটা এখন তার মগজে এসে ভর করেছে। মনে হচ্ছে নাকে, না বুকের ভেতর! নাহ্, আর সহ্য হচ্ছেনা! বুড়িটাকে শেষ করে দিলে কেমন হয়! বুড়ি চিৎকারে ফেটে পড়ুক, পাড়া মাতিয়ে তুলুক, বসুক শালিস, তার বিচার হোক, তবু সুবাসটা একবার প্রাণভরে নিতে হবে! দেখতে হবে এর শেষ কোথায়! যা হয় হবে, যা থাকে কপালে!

উঠে পড়ল নান্নু। যন্ত্রচালিতের মত এক সময় বুড়ির বেগুনক্ষেতে এসে দাড়াল। বুড়ির ঘরের বেড়া বাঁশের তরজার। দরজাও তাই। দড়ি দিয়ে বাধা। হাত দিয়ে খোলা যায়। একবারে দরজায় এসে দাড়াল। সেই গন্ধটা ঘরের বেড়ার ফাক দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কুলসুম কোন দিকে শুয়েছে কে জানে! আস্তে করে দরজার ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দড়ির বাধন খুলে ফেলল। দরজা, খুব সাবধানে, একটু ফাঁক করে দেহটা গলিয়ে দিল ভেতরে। সবদিকে দেখতে চেষ্টা করল। অন্ধকারেরও আলো আছে। দেখল একটা চাটাইর উপর বুড়ির খুব কাছাকাছি শুয়ে আছে কুলসুম। দুজনেই ঘুমে অচেতন। খুব ধীরে, কুলসুমের মাথার কাছে গিয়ে বসল। নাকটা মাথার খুব কাছে নিয়ে গন্ধটা নিতে লাগল। আহ্, কি যাদু! কি মাতাল করা সুবাস! আশ মেটেনা! নাহ্, হচ্ছেনা! আরও কাছে যেতে হবে! আরও প্রাণ ভরে নিতে হবে! কুলসুমকে আস্তে করে টেনে বুড়ির কাছ থেকে একটু দূরে নিয়ে গেল। শুয়ে পড়ল কুলসুমকে বুকে জড়িয়ে ধরে! আহ্, কি শান্তি! কুলসুমের হাত দুঠি তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। একি! সুবাস ছাড়া আরও কিসের হাতছানি! এ কিসের আহ্বান! কুলসুম কি জেগে আছে! কি আছে তার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে! আরও চেপে ধরল বুকে! বুড়ি চিৎকারে ফেটে পড়ুক, পৃথিবী শেষ হয়ে যাক, সালিস বসুক, তার ফাঁসি হোক, সে এমনি করে কুলসুমকে বুকে জড়িয়ে ধরে পড়ে থাকবে। আর তখনি বুড়ির চিৎকার, কুলসুমি কইলো? যন্ত্রচালিতের মত নান্নু উঠে দে দৌড়। ধর, ধর বলে চিৎকার করে বুড়ি পাড়া মাতিয়ে তোলল। নান্নু এক দৌড়ে ঘরে এসে খিল দিল। বাবার ধ্যানে হঠাৎ বাধা পড়ে। একজন মহিলা তার পায়ের উপর পরে ফুপিয়ে কাঁদছে আর বলছে, বাবা আমার মাইনসে আর একটা বিয়া করছে, আমারে বাচাঁও বাবা, হেই বিয়াডা যেন তালাক হইয়া যায় এই দোয়া কইরা দেও বাবা! নান্নু মিট মিট চোখে একবার দেখল, নাহ্, কুলসুম নয়।

বাবা ধ্যান করে। বার বার শত বার। দিনে রাতে। গন্ধ ছাড়াও কুলসুমের আরও কি যেন আছে! ঘরে ঢুকে বুঝল কুলসুমে সমস্ত ঘর ছেয়ে আছে। ঘরের ভেতর ছুটোছুটি করতে লাগল। তার মাথায় আগুন জ্বলছে। সুবাস ছাড়া সেটা কি? দেহের কিছু! কুলসুমের দেহে কত কি আছে! কিছুই দেখা হলনা! জানা হলনা! বুড়িটা! সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে! এ কিসের আগুন! তার মাথাটা বোধ হয় খারাপ হয়ে গেল! নান্নু পাগল হয়ে গেছে! দরজার পাশে বদনায় পানি আছে। মাথায় ঢেলে দিল। তাতে আগুন যেন আরও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল! কি করবে নান্নু! কোথায় তার সে আগুনটা। মাথায়? বুকে? নাহ্! কোথায় সে আগুনটা! পাগল হয়ে গেল আগুনের দহনে। সমস্ত পৃথিবী যেন আগুনে জ্বলছে! নান্নু জ্বলছে। আগুনের ফুলকিটা

ফেলতে হবে। না হয় তার নিস্তার নেই! সে দেখল সমস্ত আগুনের মূল তার পুরুষাঙ্গ! ওটাকে ফেলতে হবে। চোখ গেল বেড়ায় গোঁজা কাঁচিটার দিকে। গতকাল সারাদিন ধান কেটেছে এই কাঁচিটা দিয়ে। কাঁচিটা হাতে নিয়ে এক টানে আগুনের ফুলকিটা ফেলে দিল! কামেল বাবা শিউরে উঠল, দাঁত কঁটমট করে উঠল। ভক্তের দল ঝাপিয়ে পড়ল বাবার পায়ে। এই বুঝি বাবা অলৌকিক কিছু করে ফেলবে। তখনি বাবার কানে গেল, 'চাচা, খারাও, সুনাকাডা নাউন্নার মত দিখি লাগে! অখন সেলাম কইর না। আগে দেইখ্যা লই'।

চাচা ধমক দিল ভাতিজাকে। তর আছে সব আজগুবি কতা! নাউন্না কি আছে নাকি অখনও? তরে কোনখানে লইয়া গেলে ঝামেলা, না লইয়া গিয়াও পারিনা। দুনিয়ার মাইনষে বাবার কাছ থেইক্কা কতকিছু নিল, আর তুই কস নাউন্না।

বাবার চোখ একটু ফাঁক হয়েই বন্ধ হয়ে গেল। বুক কাঁপতে লাগল। এখানেও সুনাকাডা নাউন্না! মনে পড়ে সেই রাতের কথা। তারপর তার কোন জ্ঞান ছিলনা। তিনদিন পর সে নিজকে আবিষ্কার করে ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার হাসপাতালে। ভাল হয়ে বাড়ী ফিরে শুনে তার নাম বদল হয়ে গেছে। এখন সে সুনাকাডা নাউন্না। অনেক দিন পর্যন্ত চেষ্টা করেছিল এসব মানিয়ে নিতে। কিন্তু মানুষ তাকে দেখলেই খেলা জুড়ে দেয়। অতিষ্ঠ হয়ে একদিন গোপিনাথপুরের মুড়ার জঙ্গলে গিয়েছিল গলায় দড়ি দিতে। তারপর নেংটা বাবা নিয়ে গেল। সে আজ কতদিন! ১৯৬০ সালের কথা! এখনও মানুষ ভুলে নাই?

ভাতিজা বলছে, চাচা, আমার কতাডা হুন। আমার মনে অইতাছে নাউন্না। বালা কইরা দেইখ্যা লই। তুমি খাড়াও।

চাচা রেগে আগুন। আগামী সপ্তাহে পাঁচ কানি জমির মামলার রায় হবে। তাই শাহজালালের মাজারে শিন্নি দিতে এসেছিল। এসেই শুনল কামেল বাবার কথা। তার গুনের কথা শুনে চাচা ৫০ টাকা মানত করেছে। আর এই ছনা কিনা সব মাটি করে দিচ্ছে! বলল, তুই সেলাম না করলে যা, বাইরে খারা গিয়া। আমি মানতি টেখাডা দিয়া সেলাম কইরা দোয়া লইয়া আই।
তোমার মনে আছে চাচা, ছোড সমে নাউন্নারে একটা জিংলা দিয়া বারি দিছলাম, তারপর তার বাপে তোমার কাছে বিচার দিছল? কপালের হেই কাডা দাগডাও আছে, দেখ। টেখা অখন দিওনা চাচা, আগে দেইখ্যা লই।

দেখ ছনা, ঝামেলা করিস না। পাঁচ কানি ক্ষেতের মামলা। বাবা একটা শ্বাস ফালাইলে তর সব শেষ অইয়া যাইব! তর সব ছাই অইয়া যাইব! বেশি বারিস না কইয়া দিলাম! ৫০ টেখার লাইগ্যা আমি মরতামনা, বাবার দোয়ায় আমার জিত অইবই!

ছনাও রেগে গেল। আমি কইতাছি আমার কতা বিশ্বাস অয়না বুঝি! তাইলে তার কাপর উল্ডাইয়া দেখ! এ দুটো ভক্তের ঝগড়া শেষ হয়না দেখে খাদেম এসে তাদের বেড় করে দিল।

বাইরে এসে চাচা ভাতিজার তুমুল ঝগড়া। চাচার কথা পাঁচ কানি ক্ষেতের মামলা, ছনার কথা, সুনাকাডা নাউন্না। জোড় করে চাচাকে নিয়ে গেল ছনা। বলল, আইজকার রাইতটা বালা কইরা চিন্তা কর। হুজুর তো আছেই। কাউলকাও তো আওন যাইব।

চাচার সারা রাত ঘুম হয়নি। ছনা এই ঝামেলাটা করল! একবার মানত কইরা ফালাইলে আর আদায় না করলে উপায় আছে! ক্ষতির সীমা থাকবনা! চাচা ঠিক করল, ছনা যা ইচ্ছে করুক। কাল ভোরে গিয়ে মানতটা আদায় করে আসবে।

রাতে বাবাকে খাইয়ে, খাবার এবং নজরানার টাকা ভাগ করে খাদেমরা যার যার বাড়ী গেল নিয়মিতভাবে। ফজরের আজানের আগেই আসার নিয়ম। এসে দেখল বাবার আসন খালি। ভাবল, কোথায়ও আছে। অনেকক্ষন পর্যন্ত ফিরে না আসায় খুঁজতে বেরিয়ে গেল সকলে। নিশ্চয়ই রাতারাতি বেশিদূর যেতে পারেনি। এদিকে চাচার কান্নাকাটিতে ছনা চাচাকে নিয়ে এসে দেখে বাবা নেই। চাচার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। খোঁজ নিয়ে জানল, বাবা আসন বদল করেছেন। কোথায় করেছেন কেউ জানে না। ছনার মুখে মৃদু হাসি। চাচার বেজার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, চাচা কইসলামনি?

১

[1] মোল্লা বাহাউদ্দিন বর্তমান কালের একজন শক্তিশালী সাহিত্যিক। মৌলিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তার জুড়ি দু'বাংলায় মেলা কঠিন হবে। তার রচিত সাহিত্যে প্রকৃতির বর্ননা একজন দক্ষ চিত্রকরকেও হার মানাবে। বিশেষ করে কার রচিত মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের কথাচিত্র "সীমান্ত সংবাদ" এ বাংলাদেশের প্রকৃতির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। তার রচিত "কালো রক্ত " উপন্যাসটি নিষিদ্ধ দেশ সৌদী আরব সম্পর্কে পাঠকদের জন্য একটা তথ্য মূলক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবে । আমাদের মধ্যেই বাস করা মানব-মানবীদের নিয়ে রচিত রচিত ছোট গল্পগুলি সমাজের সংগতি ও গর্তগুলোকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তারই একটি "ধ্যান" পাঠকদের জন্য দেওয়া হলো । সাধারন মানুষের জীবন নিয়ে অসাধারন উপখ্যান লেখার এ প্রচার বিমূখ ও অন্তর্মুখী লেখকের কাছে আমাদের দাবী, পাঠকদের আপনার সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করবেন না। - সম্পাদক

আপনার মতামত সরাসরি লেখকে জানাতে পারেন : baharmulla@hotmail.com

অথবা সম্পাদক, সদালাপকে লিখুন : editor@shodalap.com